নীল আকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৫৬

দাম দেড় টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড পি, ১৩, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা
হইতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীল আকাশ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পূর্ব্বাশা লিমিটেড
পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

অচিন্ত্যকুমারের অন্যান্য কাব্য গ্রন্থ

অমাবস্যা : প্রিয়া ও পৃথিবী

সূচীপত্র

১	সৈন্য ও সন্ন্যাসী	১
২	পরিপূরক	২
৩	উন্মোচন	৪
৪	প্রতিবাসী	৭
৫	চাঁদ	১০
৬	চন্দ্র	১২
৭	কাগজ-ফেলার ঝুড়ি	১৫
৮	কম্পাস	১৭
৯	উদ্যম	১৮
১০	পরপৃষ্ঠা	১৯
১১	ট্রেন	২০
১২	স্তব্ধতা	২২
১৩	শাখা ও শিকড়	২৪
১৪	রোমাঞ্চ	২৬
১৫	অচাক্ষুষ	২৭
১৬	মুহূর্ত	২৯
১৭	দুইচক্ষু	৩১
১৮	লেখনী	৩৪
১৯	সার্বজনীন	৩৬
২০	প্রস্তুতি	৩৮
২১	রবীন্দ্রনাথ	৪১
২২	রবীন্দ্রনাথ	৪৩
২৩	রবীন্দ্রনাথ	৪৪
২৪	শরৎচন্দ্র	৪৬
২৫	শরৎচন্দ্র	৪৮
২৬	মহাত্মা গান্ধী	৫০

২৭	মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু	৫২
২৮	ভারতবর্ষ	৫৭
২৯	স্বাধীনতা	৬১
৩০	কাজ করো	৬৫
৩১	পুরাবৃত্ত	৬৭
৩২	এর পরে আরো এক পরিচ্ছেদ আছে	৬৯

সঞ্জয় ট্টাচার্য্য

প্রীতিভাজনেষু

সৈন্য ও সন্ন্যাসী

এসেছে সংস্কৃত সূর্য প্রদ্যোতিত মার্জিত আকাশ :
মাঠে আর আল নাই, মুছে গেছে স্তরপঙক্তিভেদ,
শোণিতে প্রস্বেদে ক্লেদে লিখিলাম যেই ইতিহাস
ধরিত্রীর ভাগ্যে তাহা অমৃত-নিস্যন্দ-আয়ুর্বেদ।

পিধানে নিরুদ্ধ অসি, পরিবর্তে ভূতলে লাঙল—
নিঃসহ সংগ্রামশেষে শ্লথতনু পেয়েছি বিশ্রাম,
ফলেছে পর্যাপ্ত শস্য বলস্ফূর্ত শ্যামল স্নেহল
ধরণীরে মনে হয় স্বপ্নময় সুখস্বর্গধাম।

মিটেছে খাদ্যের ক্ষুধা, নির্বাপিত বস্তুর জিগীষা,
ক্লেশহীন সর্বপ্রাপ্তি, দেশহীন ব্যাপ্ত অবিদ্বেষ—
তবু সেই দীপ্ত চন্দ্র, আকাশ-আকীর্ণ শতভিষা,
তবু সেই দিগন্তের ক্ষীণ প্রান্তে অনন্ত নির্দেশ।

০

তবুও অপ্রাপ্যা তুমি, কি আশ্চর্য, তবুও অধরা,
তবুও তেমনি দূরে, মূলেস্থূলে দাঁড়াবেনা আসি ;
তবুও তোমার লাগি দুই আঁখি যামিনীজাগরা—
সৈন্য আমি, যুদ্ধজয়ে পুনর্বার হয়েছি সন্ন্যাসী॥

পরিপূরক

দুর্গ গড়ি, একদিন পাবো ব'লে গৃহ,
যুদ্ধ করি, হব ব'লে অপগতস্পৃহ।
আজিকে রক্তের স্বাদ,
চমৎকার কী উৎসাদ!
একদিন হব ব'লে নিশ্চেষ্ট নিরীহ।

জ্বলিবে যে একদিন তৃপ্ত প্রাণশিখা
তারি তরে খুঁড়িতেছি শ্মশানে পরিখা।
ছাড়ি এ কঠিন মাটি
যাব ফের পুষ্পবাটি,
শয়নে চন্দনচন্দ্র, আকাশে বরিখা।

হলচল-হলাহল ফেনল ধূমল
প্রতিরোধে কেন গড়ি দীর্ঘ জনবল?
কেননা জনতা ছাড়ি
হব ফের একচারী
করিব আবার স্বীয় স্বপ্নেরে সম্বল।

তরবার খরধার, সৈনিক কৃষক,
গড়িব সে অস্ত্রমুখে হলের ফলক।

প রি পূ র ক

আজি সব ম্রিয়মান
সেদিন আসিবে ধান,
আকাশে অপরিমাণ নীল বলাহক।

আজি যদি চক্ষে তব নাহি থাকে নেশা,
লজ্জা নাই, আজি তুমি নহ মোর এষা।
আজি আর নহ তুমি
রাঙা ফুল মরশুমি
অযাত্রাসঙ্গিনী আজ নক্ষত্র অশ্লেষা।

দাঁড়ালে আমার পাশে, হাতে নিলে অসি,
তিমিরবিদারবিভা বিভূষা উষসী।
আজিকে কটির রেখা
নির্বাপিতমদলেখা,
বক্ষে নহে চেলাঞ্চল, দুর্ভেদ্য আয়সী।

কেননা আসিবে ফের কুসুমসময়
তারি তরে সূচীপত্রে বিলয়-প্রলয়।
একদা নূতন নভে
আমাদেরো ভোর হবে,
রাত্রির মর্যাদাবাহী নব সূর্যোদয়॥

উন্মোচন

এতদিন ধরে দেখেছিনু তব
রূপখানি গদ্‌গদ,
বিবশ আবেশে বিলোল লালসে
ছিলাম বশংবদ।
বিশ্রামরসে বিহ্বল লাবণী,
তরলনয়নে তুষার-দ্রাবনী,
দেহ যেন তব ভোগাবতারণী
এই শুধু ছিল জানা—
যেন চিরকাল ক্ষণ-সুখাবহ
প্রবাহে বিগাহমানা।

বেশবিন্যাসে প্রশাসিত সদা
কাষ্ঠ-পুত্তলিকা ;
পত্রছায়ায় ছিলে কুণ্ঠিতা
কলিকা অসাহসিকা।
পথ চল নাই পাছে খরতাপ
বিমলিন করে অলককলাপ,
ছায়ায় বসিয়া মৃদু মদালাপ
করো ভীরু গুঞ্জন—
কানে পশে নাই কোথায় শঙ্খ
বাজিছে ঘনস্বন।

উ ন্মো চ ন

ব্যঞ্জন করেছি চটুল চাটুতে
করেছি ব্যাজস্তুতি,
ভুলায়ে রেখেছি তব আত্মার
কঠিন প্রতিশ্রুতি।
দেখি নাই কোথা ঘনাইছে ঝড়,
দেখেছি কেবল স্ফুরিত অধর
কটিমণ্ডলে লীলার লহর
স্তবকিত ঘন লোভ—
কানে পশে নাই কোথায় রুদ্র
সমুদ্র-বিক্ষোভ।

অস্তায়মান সূর্য যেমন
রচে আরক্ত চিতা,
তেমনি আজিকে শেষ শোভা নিয়ে
হয়েছ উন্মোচিতা।
উচ্চে বেঁধেছ দৃঢ় কেশচূড়া
তাতে ফুল গোঁজা বিষের ধুতুরা,
কোথা গীত-সুর, কোথা পীত-সুরা—
বিবর্ণ বিস্বাদ,
চরণের তলে দেখেছ টলিছে
সৃষ্টির বনিয়াদ।

অলংকৃতির কীর্তি তোমার
কিনাঙ্ক-অঙ্কন,

নী ল আ কা শ

আজি আনিয়াছ বিশ্ব ব্যাপিয়া *
নূতন বিস্মাপন।
লাসবেশ আজ লাজে গেল খসি,
অসিধারাব্রতে হাতে নিলে অসি,
রৌদ্রকিরণে উঠিলে ঝলসি
উদ্যত-প্রহরণা—
অম্বরে আজি দম্ভোলি বাজে
নবীন সম্ভাবনা।

মরি, সেই তনু রুক্ষকঠোর
অস্ত্র-আঘাত-সহ
ভীরু পৌরুষে করালে নবীন
জন্ম-পরিগ্রহ।
কোথা উড়ে গেল লঘু প্রজাপতি.
হোমধূমে তুমি হলে ধূমাবতী,
বীরবতী, তুমি রথের সারথি
আর তবে কিবা ভয়,
উভয়ের আজি অভয় আকাশে
সৌর অভ্যুদয়॥

প্রতিবাসী

এত দিন ছিলাম তুমি আর আমি, এবার আমরা।
এবার দুজন।
আবার বেঁধেছি গাঁটছড়া
প্রতিরোধের সঙ্গে আক্রমণ।
দেখেছি অনেক কেলিকলা
স্খলিত মেখলা ;
ছুঁয়েছি অনেক ত্বক
আপাদমস্তক ;
নিয়েছি অনেক ঘ্রাণ
শিহরায়মান।
মুখরসস্মিত
আহা, চুম্বনটি ছিল মনোনীত ॥

দেখেছি অনেক চিলতে আকাশ,
টুকরো উঠোন ;
আলসেতে পাখির বসবাস
মাকড়সার জাল-বুনোন।
শুনেছি অনেক মিথ্যালাপ
বুকে বুক রেখে মৌখিক চুপচাপ :
বাক্য আর স্তব্ধতা
তা, একই কথা।

নী ল আ কা শ

গান আর গুঞ্জন, ভুজ-পাশ-ভুঞ্জন
একই আয়োজন।
ইন্দ্রালয় যেন এই ইন্দ্রিয়ায়তন ॥
এবার সময় হল, এল মহান দুঃসময়
নিশ্চয়
আমাদেরো হবে জয়।
রাখো এবার তবে ওসব জীর্ণ জীবনের চেকনাই,
দহন-উল্লসন লোহাকে ডেকেছে নেহাই
ডেকেছে ঘাতুক হাতুড়ি।
ছাড়ো এবার এই অকুলান কুঠুরি
ক্ষুদ্র স্বপ্নের কোণ
স্বার্থ-খণ্ডিত উঠোন।
ভাঙো এই অন্ধ আরামের কপাট।
শুনতে কি পাচ্ছনা শ্মশানশ্যেনের পাখসাট ?
তবে কালো চক্ষের কোল জুড়ি
আনো একটি অপ্রকম্প বিজুরি ;
ভঙ্গিতে আনো ঔদ্ধত্যের উদ্ধতি
রঙ্গরতি ছেড়ে হও এবার অভঙ্গব্রতী ;
মুখে আনো কোপ
ধনুকে জ্যা-আরোপ।
দূর বাতাসে তীরক্ষেপের ধ্বনি
কটি-কিঙ্কিণির বদলে বাজুক এবার যুদ্ধাস্ত্রের রনরনি।
অমুষ্টিমেয় আকাশ আজ অনন্তজীবী
আমাদের অঙ্গন সমস্ত পৃথিবী ॥

প্রতিবাসী

আমরা এবার দু'জন
দুর্বারণ
রক্তাক্ত পায়ে আসমুদ্র চরণ-চারণ।
নই আর আমরা মুখোমুখি
গদ্‌গদ দুখে দুখী।
আমরা এবার পাশাপাশি
পরস্পরের প্রতিবাসী।
তীর আর তূণ
অরণি আর আগুন ;
দীপ্তি আর দাহ
ধৈর্য আর উৎসাহ ;
তেজ আর মরুৎ
স্ফুলিঙ্গ আর বারুদ।
আমরা দু'জন
প্রতিরোধ আর আক্রমণ ॥

চাঁদ

মুক্তির নিশ্চিন্ত শব্দ একটানা ধ্বনিল আকাশে
বাহিরে আসিতে তবু ভয় :
মনে হল নগ্ন চাঁদ ছিন্নভিন্ন পড়ে আছে ঘাসে
গলিত, দলিত, রক্তময়।

বাহিরে দাঁড়ানু এসে, ঝলিতেছে সেই চেনা চাঁদ
ঝরিতেছে শীতল ময়ূখ,
এ তো নয় সেই জ্যোৎস্না রজনীর অলজ্জ আহ্লাদ—
অগ্নিজিহ্বা খরশরমুখ।

মৃত্যুর দূতিকা এ যে ত্রাসগ্রাস ধ্বংসের ধাবিকা,
উগ্রস্পশ্য আজি তার হাসি—
এ মরীচি ভ্রমজাল, ছদ্মবেশী এ যে মরীচিকা,
হিংসাহীন, আসলে মাংসাশী।

এতদিন প্রেম ছিল, ছিল সাথে প্রমোদকল্লোল,
গতক্লম কোমল বিরহ,
দুলেছিল এতদিন বাহুবন্ধে আনন্দ-হিন্দোল
বিশ্ব ছিল বিস্ময়-আবহ।

চাঁদ

কেননা সে চাঁদ ছিল সমুৎফুল্ল সমুদ্রচন্দ্রিকা,
আদিগন্ত ছিল অনাবৃতি—
আজি তার বাঁকা ঠোঁটে অকৌতুকে আঁকা বিভীষিকা,
দুই চোখে বীভৎস বিকৃতি।

অরণ্যচন্দ্রিকা আজ, নির্বাসন, নির্বাণ-প্রাপন :
আজি মোরা অন্ধকার ঘরে
কৃষ্ণবর্ণ শেষ তিথি করিতেছি একান্তে যাপন
নবতন প্রভাতের তরে।

ধরণীর গলগ্রহ, মৃতগ্রহ, জর্জরিত-জরা,
কক্ষচ্যুত হবে উৎসাদ,
নতুন মৃত্তিকালেপে গড়া হবে যবে বসুন্ধরা
নতুন উদয় হবে চাঁদ।

ততদিন চাঁদ নাই, অশ্রু নাই, নাই কোনো হাসি
নাই কোনো প্রেম কিংবা ক্ষমা ;
আছে শুধু অভ্রলেহী লোলজিহ্বা ক্ষুধা সর্বগ্রাসী
উদ্দাম উদ্ভ্রান্ত পরিক্রমা॥

চন্দ

এত দিন জানতাম চন্দনপঙ্ক,
ভালো লেগেছিলো ওর আননকলঙ্ক।
সেটুকুতে ছিলো ধার
ঢল ঢল রসভার,
অঙ্কশায়িনী ছিলো, ছিলো পর্যঙ্ক।

তব সাথে এত দিন-প্রেম-রোম-অঞ্চ,
দেহমণ্ডলে ছিলো রতিরাসমঞ্চ।
আজি সব পাতাঝরা,
ছেঁড়া যত গাঁটছড়া,
পাখি সব বাসাহারা, ছিন্ন মালঞ্চ।

তোমারো সহসা আজ একি যতিভঙ্গ,
জঙ্গী হয়েছ দেখি ছেড়ে রসরঙ্গ।
তুমি কিনা বিদ্বিষ,
শায়কে মেখেছ বিষ,
ছড়ায়ে দিয়েছ রিষ অনলতরঙ্গ।

তব তরে মনে ছিলো কত না প্রশংস,
শর্বরী ছিল শ্বেত উড্ডীন হংস।

চ ন্দ

হৃদয়ের ছিল আলী,
একটি একটি ফালি,
আনতো শেষের ডালি কামনাবতংস।

সেই তুমি মৃত্যুর হলে সূচীপত্র
যে তুমি একদা ছিলে আরোগ্যসত্র।
সেই যে রূপসী রাত
হয়ে গেছে উৎখাত,
আজ সে করালপাত প্রলয় পতত্রে।

রাখো রাখো নাগরালি যত পরিবন্দ
চুম্বনে দংশন—কপট প্রবন্ধ।
আজকে করেছে ভিড়
যত সব নতশির,
গতশির সাহসীর—স্কন্ধ কবন্ধ।

কুট্টিম সেই আছে আছে সে কুটঙ্ক
সঙ্কুল গিরিপথে কৃশ নদীবঙ্ক।
তৃষ্ণার জল নেই,
জীবনে দখল নেই,
ভিক্ষায় ফল নেই, আকাশে আতঙ্ক।

ছলছল এ ছলনা আর নয় সহ্য,
গদগদ তব ভাষে ভাব-আতিশয্য।

নী ল আ কা শ

এ নিশি চান্দ্রমসী
হয়ে যাক সব মসী,
তুমি যদি যাও খসি, হই গতলজ্জ।

পরাস্ত তুমি চাঁদ হয়ে যাও অস্ত,
আবার ধরণী হোক নতুন পয়স্ত।
সেদিন প্রেমের যাগে
যদি যা তোমারে লাগে,
এসো তবে অনুরাগে হয়ে ধোপদস্ত।

ততদিন থাকো বাদ চাঁদ দুর্দর্শ,
তোমাকে দিয়ে যে আর মেটে না এ তর্ষ।
পৃথিবীর তুমি বোঝা,
নেমে যাও বলি সোজা,
অমা আজ প্রিয়তমা—শোনো পরামর্শ।

কাগজ-ফেলার ঝুড়ি

সম্পাদকের টেবিলের নিচে
কাগজ-ফেলার ঝুড়ি,
জমে আছে যত অনির্ব্বাচিত
কবিতার কারিকুরি।
বোবা আখরের বাজে আঁকিবুঁকি,
তবু তারি ফাঁকে আকাশের উঁকি
ছিল না কি এতটুকু ?
ছিল না কি আঁকা কারো কালো আঁখি
কালো চুল রুখু রুখু !

হয় তো বা ছিল অবোলা ভাষার
ভণিতার কিছু ত্রুটি ;
সেই অপরাধ হয় তো তারার
অশ্রুতে আছে ফুটি'।
ওদেয়ো আকাশে এসেছিল চাঁদ,
চোখে এনেছিল বিফল বিষাদ,
ক্ষণিক সুখের শিখা—
যত ছিল আশা, অধিক কুয়াসা,
মরু, নাই মরীচিকা !

নী ল আ কা শ

মিলন ওদেরো মিলে নাই, তাই
কবিতারো নাহি মিল ;
উমা ছিল ঠিক ; উপমায় কিছু
হয়েছিল গরমিল।
এত বলিয়াও রহিল নীরব,
ভাববিরহিত গাঢ় অনুভব
ভাষায় তা অকুলান ;
ব্যাকরণহীন বেদনার কাছে
মূক হ'ল অভিধান।

সম্পাদকের টেবিলের নিচে
কাগজ-ফেলার ঝুড়ি—
অমনোনীত এ মানুষের মেলা
রয়েছে পৃথিবী জুড়ি।
জীবনে যাদের মেলে না ছন্দ,
বিধাতার তারা নহে পছন্দ,
রয়েছে দ্বীপান্তরে ;
তবু নিরাশায় প্রতি সন্ধ্যায়
প্রদীপ জ্বালিছে ঘরে॥

কম্পাস

স্ফুরিত তড়িতে খর অসি-নিষ্কাশ,
উত্তাল ঢেউ বিপুল বিপর্যাস।
জাহাজ যদিও ডুবো,
তারা আছে ঠিক ধ্রুব;
উত্তর দিকে ঠিক রেখো কম্পাস।

বাজ নেই, নেই বাজপক্ষীর নখ,
সংগ্রামী কেউ, কেউ বা সমর্থক।
নেই কুঁড়া নেই খুদ,
নিস্তূণ, নিরায়ুধ,
ভঙ্গিটি শুধু রেখো তিথ তির্যক।

অরণ্যে রেখো অরণির প্রস্তুতি
রাতের অর্থ আগামী দিনের দ্যুতি।
আজি যা স্তব্ধ গনি
আসন্নে প্রতিধ্বনি
নিথর পাথরে ভিত্তি-প্রতিশ্রুতি।

শুষ্ক শাখায় কিশলয়-উল্লাস
শ্বাসহীন বুকে রেখো এক বিশ্বাস—
জাহাজ যদিও ফুটো
তীর তবু প্রস্ফুট
উত্তরে আছে উত্তরে কম্পাস॥

উদ্যম

মাঝে-মাঝে দেখা দেয় উলঙ্গ উদ্যম।
তরস্বান বীর তুরঙ্গম
মাঝে-মাঝে বাঁকা করে ঘাড়
ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায় রজ্জুরশ্মিভার।
জোরের জোয়ার
তরঙ্গিত করে তোলে পেশী,
মুখে আনে স্বতস্ফূর্ত হ্রেষা,
যেন কোন সাম্রাজ্য-অন্বেষী—
চক্ষে জ্বলে সংগ্রামের নেশা!
চর্মে ঝলে চিক্কণ চিকুর,
অগ্নিময় খুর
ছিন্ন করি ভিন্ন করি পথের পাথর
সহর্ষ-ঘর্ষণ উন্মুখর
ছুটে চলে উগ্র অগ্রসর—
পিঠে তার অকস্মাৎ জন্ম নেয় পাখা।

তারপর চেয়ে দেখি ঘুরিতেছে চাকা
পিছে তার। বেগবীর্য ছাড়ি
চাবুকজর্জর মাংসে টানিতেছে ভগ্নপ্রায় গাড়ি॥

পর পৃষ্ঠা

অভ্যাস-আড়ষ্ট পৃষ্ঠা ধীরে-ধীরে চলেছি উলটি'
অর্গল-আবদ্ধ কক্ষে ; অস্পষ্ট জীবনবোধ, পথ
পঙ্গু, পরাঙ্মুখ ; ভাগ্যের হয়েও কিনা প্রতিরথ
দৈবেরি দাসত্ব করি ; ঘোরঘটা দেখিলেই ছুটি
আপনার অটল কোটরে ; ক্ষীণ ক্ষণ-খণ্ড ক'টি
খুঁটি শুধু কদর্য কার্পণ্যে ; ক্ষুদ্র ক'রে স্বত্ব-সীমা
নিষ্ক্রিয় রক্তের স্বাদে অনুভবি বুদ্ধির জড়িমা,
গৃহস্থ শিবেরে চিনি, ভয় করি দ্বারস্থ ধূর্জটি।

তার পর এক দিন তৃণ-প্রাণে নেমে আসে ঝড়
অনশ্বর। পথেরে বিমুক্ত করে অভিন্ন প্রান্তরে ;
পুড়ে যায় জতুগৃহ, উড়ে যায় শৃঙ্খল-শৃঙ্খলা,
দিনানুদৈনিক দৈন্য ; জীবনের শিকড়-শিখর
ন'ড়ে যায়, প'ড়ে যায় ভেঙে, অকস্মাৎ নভান্তরে
সবলে উত্তীর্ণ হই, দিশালিকা উদয়-উজ্জ্বলা॥

ট্রেন

মধ্যরাতে যখনই আমার ঘুম ভেঙে যায়
নীরবতায় নীল নিঃসঙ্গ সে মধ্যরাত্রি—
শুনতে পাই আমি কেবল ট্রেনের শব্দ :
যেন কোথায় ট্রেন চলেছে।

যেন কোথায় ট্রেন চলেছে
কোন বিস্তীর্ণ-নির্জন মাঠের উপর দিয়ে
অন্ধকার দীর্ণ করে
দ্রুতগামী দীর্ঘশ্বাসের মত।
যেন কোথায় ট্রেন চলেছে
ঘূর্ণমান চাকার হাহাকারে
এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তহীনতায়

আমি দাঁড়াই গিয়ে তখনি নীল আকাশের নিচে
কিন্তু কোথাও হায় দেখতে পাইনা সে-ট্রেন।

অথচ শুনি কেবল তার শব্দের শিহরণ
তার দ্যুতিমান গতির তীব্রতা

নীল আকাশ

তারায় আর তৃণে, শাখায় আর শিকড়ে
শুনি আমার এই ধাবমান ধমনীতে
আমার লবণাক্ত লোহিত রক্তের মধ্যে
মধ্যরাত্রির স্তব্ধতার এই গলিত অনর্গলতায়—
যেন কোথায় ট্রেন চলেছে অন্তহারা ॥

স্তব্ধতা

আমি শুনতে পাই শুধু স্তব্ধতা
ঈশ্বরের প্রবল অট্টহাস্য দিয়ে যা তৈরি,
যা তৈরি আমার মৃত্যুর উপস্থিতি দিয়ে।

জলের উপর যখন বৃষ্টি ঝরে পড়ে
আমি শুনি শুধু জলের অবিরল শীতলতা,
আর যখনই তুমি কথা কয়ে উঠেছ
আমি শুনেছি শুধু তোমার কথার সমাপ্তি।

গর্জমান সমুদ্রের তলায় আমি দেখেছি শুধু বিশ্রাম
বস্তীর্যমান মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আমি দেখেছি শুধু বিস্মৃতি।

আর, যখনই পাখি মেলেছে তার অস্থির পাখা
জাহাজ চলেছে তার দূর-দীর্ঘ মাস্তুল তুলে
অন্ধকারে জন্মের কোটরে কোনো শিশু উঠেছে কেঁদে
কিংবা মসৃণ হয়ে তুমি যখন আমার কোলের কাছটিতে এসে বসেছ

নী ল আ কা শ

যে আকাশ ছিল মনে-পড়ার মত নীল
আর যে আকাশ ছিল ভুলে-যাওয়ার মত শাদা
আমি শুধু শুনেছি এক অপরূপ শূন্যতা।

বোজানো বইয়ের মত সারি-সারি কতগুলি বাড়ি—
আর অর্থহীন কতগুলি আমরা অক্ষর :
আমি শুনছি শুধু এক সুবিশাল স্তব্ধতা
আমাদের জীবনের সেই শেষ মুখর সৃষ্টি
সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সশব্দ বিস্ময় ॥

শাখা ও শিকড়

তোমরা চলে যাও শাখায়, আমি চলে যাব শিকড়ে :
তোমাদের জন্যে থাক পুলকিত পাতার প্রচুরতা,
ফলবান প্রবল সমারোহ ;
আর আমার জন্যে রুক্ষ রিক্ত এই মূল
এই উলঙ্গ বিশ্রাম।
তোমরা ছড়িয়ে পড়েছ আকাশে
উজ্জ্বল উচ্ছৃঙ্খলতায়,
সমীরিত সবুজ রশ্মিজালে ;
আর আমি নেমে এসেছি মাটিতে
মার জঠরের মত প্রশান্ত সেই মাটিতে,
যেখানে শুধু নির্বাপন আর অব্যাহতি।

তোমরা প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহ করছ,
বাধার অনুপাতে নিজেদের করছ বিস্ফারিত,
ঝড় আর পাথর, দেয়াল আর নগরী—
আর আমি নিজেকে এখানে ছেড়ে দিয়েছি
যেখানে গিয়ে না কেন পৌঁছুই,
যা না কেন আমি হয়ে উঠি
আমার এই নির্বারিত দুর্বারতায়।

নীল আকাশ

অগণন আঙুলে তোমরা হাত বাড়িয়েছ সূর্যের দিকে
যে সূর্যকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ চোখের সমুখে,
দিনে-দিনে যে ক্ষীণ হয়ে আসছে ;
আর আমি চলেছি মাটির তলাকার
অন্ধকার, অজ্ঞাত সূর্যের সন্ধানে—
আমার আত্মার আদিভূত অতল সেই অন্ধকারে ॥

রোমাঞ্চ

তখন অনেক রাত ফিরিতেছিলাম একা বাস-এ ঘাড় গুঁজে,
চর্মময় সর্বদেহে লেপে আছে ক্লেদক্লেশ স্থূল অবসাদ,
হঠাৎ চমক লেগে চেয়ে দেখি জ্বলিতেছে পূর্ণিমার চাঁদ
ডালহৌসি স্কোয়ারের কালো জলে জি-পি-ওর নিটোল গম্বুজে।

অনেক রোমাঞ্চ আমি পাইয়াছি এ-জীবনে বহু অসময়ে,
অনেক ঝড়ের রাত্রে নিষ্প্রদীপ নিরুদ্দেশ দীর্ঘ পথ চলা—
জীবনে অনেক স্পন্দ আনিয়াছে নিরানন্দ বহু বিশৃঙ্খলা,
ভয়স্ফুট স্তব্ধ রাতে, অর্ধচ্যুত আলিঙ্গনে, অসিদ্ধ প্রণয়ে।

তারপরে এ রোমাঞ্চ! ইতিমধ্যে ক্লিশ্যমান যদিও অভ্যাসে
ক্ষয়ে' গেছে সব ধার, মুছে গেছে সব মোহ, ধুয়ে গেছে স্বাদ,
গণিকা-ক্ষণিক-স্নেহ—নাগরিক আকাশের অবান্তর চাঁদ
বহু দিন ব্যবধানে শিহরি তুলিল বুক ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাসে।

অচাক্ষুষ

এখন যখন হাতে আমার অনেক কাজ
সাবেক আর নতুন,
সংক্ষিপ্ত যখন রাত্রি
আর সংকীর্ণ যখন দিন,
উদাসীন, তুমি আসতে পারো।
এখন যখন একেবারে আমি নিঃসময়।

বিশ্বময় কোথাও কি নেই বিস্ময়?

দশটা বারো মিনিটে আসে ট্রেন—
সীমায় আবদ্ধ একটু চক্রিল চাঞ্চল্য
সীমায় আবদ্ধ একটু লুলিত স্তব্ধতা।
এগারোটা বত্রিশেও যদি সে আসে
দশটা বারো মিনিটেরই সে ট্রেন।

সব কি নেমে দাঁড়াবে সমতল অভ্যাসে?

তন্বুতরমধ্যা বাতায়নবাসিনী যে মেয়ে—
পলায়মান দিগন্তের সঙ্কেতে ধারালো,
চলে এলো সে ঘরের মধ্যে:
অসহিষ্ণু স্রোত গিয়ে দাঁড়ালো স্থবির সরোবরে।

অ চা ক্ষু ষ

শরীর কি শুধু মাংসের তামাসা ?
সমস্ত মুখস্থ ?
হীয়মান সূর্য, ম্রিয়মান কি তাই আশা ?

প্রত্যহের সূর্য :
প্রত্যহের টাইম-পিসে দম-দেয়া।

তার পর, এখন যখন আমি মোটেই প্রস্তুত নই,
ডুবে আছি যখন কাজের বল্মীকে,
চতুর্দিকে দুয়ার-জানালা যখন খোলা,
অচাক্ষুষ, তুমি আসতে পারো।
হে দশদিঙ্মুখ মৃত্যু,
একমাত্র রোমাঞ্চ এখন তোমার সাম্মুখ্যে।

মুহূর্ত

হঠাৎ মুহূর্ত আসে
ক্ষণদ্যুতি বিদ্যুতের বিকাশে :
অতিশ্রমে যখন তন্দ্রা,
রাত্রি তখন সচন্দ্রা।
মাংস যখন শিথিল,
রক্ত যখন নিস্পৃহ,
তখনই আকাশ থাকে আকপিল—
গুঞ্জন করে মধুলিহ।

হঠাৎ মুহূর্ত আসে
ট্র্যামে আর বাস্-এ
উদ্ব্যস্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে ;
তখন গ্রামের মাঠ ভরেছে গ্রীষ্মের ঘাসে
আর, গুহা সবল জলোচ্ছ্বাসে।
কিম্বা যখন লুপ্ত আছি আপিসে
সই আর সুপারিশে,
আকাশ আকীরিত হচ্ছে পাখিদের শিসে।
আসছে ভেসে বজ্রের স্বর
সঙ্গে বিদ্যুতের স্বাক্ষর।
জেলের দ্বারপালের মতই ধূর্ত
এই সব মুহূর্ত।

মুহূর্ত

তখনই জয় করবার মুহূর্ত আসে বেহুদা,
যখন জঠরে জ্বলন্ত ক্ষুধা ;
তখনই খুলতে ডাক দেয় অর্গল
যখন স্কন্ধ আর বাহু বিমর্ষ, দুর্বল,
যখন চক্ষে পড়েছে ছানি,
তখনই পর্বতের হাতছানি।

কিন্তু আসবে নাকি সে ধার্য সময়,
যখন তোমাতে-আমাতে হবে অধৈর্য পরিচয় ?
যখন শরীরে জাগবে আহ্লাদ,
তখনই উঠবে চাঁদ,
জঙ্গলে ধানের আবাদ।
তখনই পাখার ঝাপটা দেবে পাখিরা
মৃতকাষ্ঠ অরণ্যে জাগবে চাঞ্চল্য,
যখন রক্তে বাজবে মৃত্যুর মন্দিরা
ভাবব না আর অন্য কি কল্য।
তখন আসবে শুধু একটি একক মুহূর্ত
যখন ক্ষুদ্র শঙ্খের স্বরে সমুদ্র হবে প্রতিমূর্ত।

দুই চক্ষু

আমাদের দুই চক্ষু খোলা,
দক্ষিণ স্ফটিকস্বচ্ছ বামচক্ষু ঘোলা।
কেবলি পল্বল নহে, নদী দেখি আবর্তচঞ্চলা।

রণস্থলে জ্যোৎস্না গলে, শ্মশানে সবুজ,
বাতাসে কেবল নহে বারুদ কার্তুজ
থেকে-থেকে ঘ্রাণে লাগে সুসভ্য সৌরভ।
এই দেহ নয় শুধু শব—
পুতিগন্ধ নয় শুধু পূতিগন্ধ এখনো সুলভ ;
জীবনের নাটকের কুশীলব
নয় শুধু দুঃখ আর গ্লানি,
বসন্ত নিশ্বাস আছে নয় শুধু ঝড়ের শাসানি,
আর আছে নীলাকাশ চিরন্তন সৌভাগ্যের মতো,
শূন্যবক্ষে কম্প্র আশা আছে তো অন্তত।

•

রক্তলিপ্ত এই যে আহব,
এ কি শুধু মৃত্যু দিয়া করিব লাঘব
প্রাণের কি রাখিব না স্থান ?
তার তরে কিছু স্বাস্থ্য কিছু দীপ্তি কিছু মনোহরণের গান
রাখিব না লিখে ?

দুই চক্ষু

যাহা কিছু পাই নাই কেবলি কি তাহার নিরিখে
কষিব এ বাঁচিবার দাম ?
আজ যদি ক্ষয়ক্ষীণ আছি ক্ষুধাক্ষাম,
দোষ তাতে আহার্য জিনিসে ?
অমৃত মেলেনি ব'লে ক্ষুধাশান্তি করিব কি বিষে ?
আজ যদি খিন্ন ম্লান রোগে দিন কাটে,
পারিপার্শ্ব-উর্ধ্ব বিশ্ব দেখিব কি হলুদ, ঘোলাটে ?
দ্বার আজি রুদ্ধ ব'লে বন্ধ নাহি হবে পরিকর,
বাম চক্ষু বাম ব'লে ভামহীন রবে বামেতর ?

ভুলিনা কাহারে,
কাহারেও অপমান করি না অশ্রেয় অস্বীকারে।
যুদ্ধের শিবিরে
ক্ষণ-রণ-বিরতির তীরে
মনে পড়ে গৃহস্পৃহ স্বপ্নলীন স্নিগ্ধ প্রেয়সীরে।
ঘাতমুখ তিক্ত রক্তক্ষর,
তাহাতে মোছে না তবু অশ্রুলেখ্য প্রেমের অক্ষর,
যেমন মোছে না ঝড়ে আকাশের স্থিতি।
প্রকৃত যা ঠিক থাকে বদলায় পদ্ধতি-প্রকৃতি।
প্রকৃত দক্ষিণে তাই বামচক্ষে বিকৃত আসীন,
সৃষ্টি তাই স্পষ্ট সর্বাঙ্গীন।
দুঃখের দহন সাথে আনন্দ-দোহন চলে তাই,
কাতর আর্তির কণ্ঠে উল্লাস-উজ্জ্বল গান গাই।

আনন্দ করি না অস্বীকার,
যেই হেতু এ-আনন্দে মোদের প্রথম অধিকার।

আজ যদি ক্ষুধাখাদ্যে না থাকে সমতা
তবু না শুকায়ে দিব সুধাস্বাদ-গ্রহণ-ক্ষমতা।
যদি আজ রক্তে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে রোগের তাড়না,
তবুও রাখিব চোখে সম্ভোগ্য আরোগ্য-সম্ভাবনা।
অবার্য নিশ্ছিদ্র অন্ধকার
সঙ্কেতিবে নিশাবসানের অঙ্গীকার।
এক চক্ষু ঘনাচ্ছন্ন অন্য চক্ষু পরিচ্ছন্ন তাই;
কোনো ভয় নাই,
আমাদেরো সমাসন্ন দিন—
বাম চক্ষু বাম ভাই দক্ষিণ দক্ষিণ।

৫

লেখনী

আমরা নিরস্ত্র নই, হাতে আছে শাণিত শায়ক
সমুদ্যত, অমোঘ লেখনী,
শল্য সে যে সকণ্টক, লক্ষ্যবেধী, যন্ত্রণাদায়ক,
নহে শুধু বিশল্যকরনী।

তোমার হাতুড়ি আছে, দুর্বিনীত অবাধ্য লোহারে
নিয়ে আস বক্র, নম্র বশে,
তোমার লাঙল আছে, হরিণ্ময় হিরণ্য সম্ভারে
ছবি আঁকো মাটির নিকষে।

তেমনি লেখনী মোর, তার তপ্ত তীক্ষ্ণ তিক্ত মুখে
ক্ষয়হীন তেমনি ইস্পাত,
এতে নেই সেই স্বপ্ন ভাসে যাহা ভারশূন্য সুখে,
আছে এতে কঠিন সঙ্ঘাত,

উর্দ্ধস্বান বজ্রের ঘোষণা। অপচিব এই ধার
কাটি শুধু কাগজের ফুল ?
নির্জনে বিরলে ব'সে অন্ধকারে করি' স্তূপাকার
মমি আর মোমের পুতুল ?

ইস্পাত নিষ্ফল তবে। মৃত কাষ্ঠে কে আনিবে তবে
হব্যলোভী আগুনমন্থন ?
সমুদ্র-শাসন হবে কী কার্মুকে, কারে দিয়ে হবে
অচলিষ্ণু পাষাণ-ছেদন ?

সে আমার-তোমার লেখনী। আমাদের মহা দায়
বহি এই অজেয় পতাকা ;
আনিব নিদ্রিত বক্ষে বাঁচিবার তীব্র অভিপ্রায়
চক্ষে হানি' অঞ্জন-শলাকা।

রক্তে আনি দাহ চিতাগ্নির। যেমন সবল হল
ধন্য হয় শস্যের উদ্গমে,
তেমনি সমাজভূমে আমরাও ফলাবো ফসল
আমাদের সামান্য কলমে।

কুসুম-আয়ুধ নয় এ কলম, ইন্দ্রের অশনি,
আর গান নয় সৌবস্তিক,
রণস্থলে চলিয়াছি লেখনিক আমরা অগ্রণী
বলব্যগ্র সশস্ত্র সৈনিক।

সার্বজনীন

শুধু আমি রচি তার গান,
যে-জীবন ক্লান্ত, পঙ্গু, ক্ষুধাক্লিষ্ট, ঘৃণ্য, মুহ্যমান ;
পাপলিপ্ত অঙ্গে যার লাগিয়াছে লালসার ধূলি,
যে-ললাট ছোঁয় নাই সেবামৃতসুস্নিগ্ধ অঙ্গুলি,
জীবনের দাবদাহে মিলে নাই যার স্নেহ-সন্ধ্যার সন্ধান,
রচিতেছি আমি তারি গান।

ধূলিরুক্ষ রাজপথে নিরাশ্রয় যারা পরিশ্রমী,
যুগ্মকরে তাহাদেরে নমি ;
মরণের স্নেহ যেন,—সর্ব অঙ্গে ঝরিতেছে স্বেদ,
জীবনে ঘুচালো যারা মৃত্যু আর মৃত্তিকার ভেদ,
শির পাতি' লয় যারা একচক্ষু বিধাতার অমোঘ কুঠার,
তাদের জানাই নমস্কার।

শুধু আমি রচি তাঁর গান,
জীবনের সম্পূর্ণতা যার মাত্র জীবনাবসান ;
এক মুষ্টি নিশ্বাসের প্রীতিহীন যে-প্রতিযোগিতা
জীবযাত্রারথতলে বিরচিলো বিস্মৃতির চিতা,
বিধাতার বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি-চেয়ে মহত্তর যার পরাজয়,
তারি গানে যাপিনু সময়।

০

নী ল আ কা শ

দিবালোকে তারাহীন রজনীর করে উপাসনা,—
বুঝিলাম তাদের বেদনা ;
যাহাদের প্রেমপদ্ম গন্ধহীন, নিত্য নিমীলিত,
সন্ধিৎসু সে-কামনার উল্কা যারা আকাশ-স্খলিত—
আপনার দীর্ঘশ্বাসে ক্ষীণ-আয়ু প্রতীক্ষার প্রদীপ নিবালো,
তারি তরে জ্বালিলাম আলো।

তারি তরে বেদনা ঘনায়,
অঙ্গের লাবণ্য যার উপমেয় প্রিয়ঙ্গুলতায়।
অনন্ত বিরহ সহে, তবু হায় অনন্ত বিস্মৃতি,
যে কখনো চিনিলো না লোকাতীত স্বপ্নের অতিথি,
তৃষ্ণাকায়া মরুচারী, ক্ষীণশিখা, ক্ষণস্থায়ী, অমূর্ত্ত প্রতিমা,
তবু গাহি তাহারি মহিমা॥

ধূলি যার জীবখাদ্য, অশ্রু যার বিষাক্ত পানীয়,
আমি কবি, আমি তার প্রিয়।
আমারে করেনি মুগ্ধ সমুদ্র বা নক্ত মনোরম,
কলঙ্কের কবি আমি ; সাথী মোর কণ্টক, কর্দ্দম ;
সঙ্গীত শোনেনি যে-ই, করিয়াছে ক্ষমাহীন, অক্ষম সংগ্রাম,
তারি তরে বাহু বাড়ালাম॥

প্রস্তুতি

প্রস্তুত আছি সর্বদা,
শান্ত আর সহিষ্ণু।
হোক সূর্য তোমার ক্ষয়িষ্ণু
আর ক্ষয়হীন তোমার ক্ষণদা,
আমি আছি প্রস্তুত।
ধূমজ্যোতিসলিলমরুৎ
না হয়ে, যদি বলো হতে বীতঅম্লজান
নির্বাষ্প পাষাণ
স্খলৎশক্তিমান,
আমি রাজি আছি খসে পড়তে
মহাশূন্যের গর্তে।
যেমন তোমার পরিবেশ
তেমনি আমার উন্মেষ
হে অন্তরীক্ষ।

যদি বলো, দুর্ভিক্ষ,
অনাবৃষ্টি,
দিকে-দিকে দরিদ্রিত দগ্ধ দৃষ্টি,
আমি আনবো সেই হাহাকার
অ-হল্যা মৃত্তিকার ;

নীল আকাশ

তোমার না যদি হয় চক্ষুলজ্জা
সাজাবো শ্মশানশয্যা
স্তূপে-স্তূপে,
তোমার ধ্বংসের ধধূপে
উড়বে না-হয় ধূমধ্বজা।
আমি যে ধরিত্রী
ছিলাম প্রাণের প্রসবিত্রী
হবো না-হয় অপ্রজা।
যেমন তোমার বেষ্টনী
তেমনি আমার প্রতিধ্বনি
হে প্রশস্ত।

যদি বলো, মুছে ফেলতে এ বৈরস্ত,
ফলাবো না-হয় শস্য
উদ্দাম শ্রাবণের স্ফূর্তি
শ্যামল পরিপূর্তি,
গোলায়-গোলায় ধান
অজস্র ও অসাবধান।
আনবো তখন না হয় গদগদ চাঁদের অভিলাষ
আত্মহারা আকাশ,
নিস্তব্ধ ঘুমের প্রশান্তি।
প্রাক্তন সূর্যের শেষ হবে অয়নক্রান্তি।

প্র স্তু তি

আমার এই স্ফীতি বা কার্শ্য
যেমন তোমার পরিপার্শ্ব,
হে অবার্য উপস্থিতি।

নাও আমার এই প্রত্যহের স্তুতি,
প্রসন্ন প্রস্তুতি।

রবীন্দ্রনাথ

আমি তো ছিলাম ঘুমে
তুমি মোর শির চুমে
    গুঞ্জরিলে কি উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে-কানে,
চলো রে অলস কবি
ডেকেছে মধ্যাহ্ন রবি
    হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে।
চমকি উঠিনু জাগি
ওগো মৃত্যু-অনুরাগী
    উন্মুক্ত ডানায় কোন অভিসারে দূর পানে ধাও,
আমারো বুকের কাছে
সহসা যে পাখা নাচে
    ঝড়ের ঝাপট লাগি হয়েছে সে উদাসী উধাও।
দেখি চন্দ্র সূর্য তারা
মত্ত নৃত্যদিশাহারা,
    দামাল যে তৃণশিশু নীহারিকা হয়েছে বিবাগী,
তোমার দূরের সুরে
সকলি চলেছে উড়ে
    অনির্ণীত অনিশ্চিত অসীমের অশেষের লাগি।
আমারে জাগায়ে দিলে,
চেয়ে দেখি এ নিখিলে
    সন্ধ্যা উষা বিভাবরী বসুন্ধরা-বধূ বৈরাগিনী,

জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জ্বলে
কূল হতে নিল মোরে সর্বনাশা গতির তটিনী।
তুমি ছাড়া কে পারিত
নিয়ে যেতে অবারিত
মরণের মহাকাশে মহেন্দ্রের মন্দির সন্ধানে,
তুমি ছাড়া আর কার
এ উদাত্ত হাহাকার
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে॥

রবীন্দ্রনাথ

মার্তণ্ড সহেনা চক্ষে, নভস্থল অতি অনস্তিক,
দৃষ্টিরে ব্যাহত করে অভ্রলিহ পর্বতের চূড়া—
ছোট ঘরে সন্ধ্যাবেলা তাই সব বসেছি বন্ধুরা
তোমারে বিদায় দিতে, বামমার্গী মোরা সাম্প্রতিক।
পলায়ন-মনোভাবী কাব্য তব অসার অলীক
প্রকৃতির আরত্রিক শুধু, কদাচ তোমার দ্বারা
আলোচিত হয় নাই প্রত্যহের জৈব সমস্যারা ;
চেতনায় একা তুমি, দলবদ্ধ নহ ঐকত্রিক।

হা অধুনা! অচিরজীবিনী! যত করি মাধুকরী,
অনির্বেয় আত্মার পিপাসা। ঘুরে-ঘুরে যায় চাকা
কালের আলোড়ে। কিন্তু আকাশ মোছেনা কভু ঝড়ে।
তাই শেষে একদিন রাশি-রাশি শব্দের লহরে
অন্যত্রের বার্তা আনে বেগবান বিদ্যুৎ-বলাকা,
নদীর এপারে আসে স্থানহীন ক্ষুদ্র স্বর্ণতরী॥

রবীন্দ্রনাথ

তোমারো বিশেষ সংখ্যা ! সব যেন শেষ এর পর
সব যেন অতি সাধারণ ।
দিবালোকে দীপাবলি । প্রতিদ্বন্দ্ব চলে পরস্পর
কার কত অরণ্যরোদন ।

আয়োজন প্রয়োজনহীন । এই যে কবিতা আমি
লিখি, বহি ভাবের বেদনা,
এই যে কল্পনা মোর বিবন্ধনা সীমান্তরগামী
এ তো শুধু তোমার প্রেষণা ।

এ তো শুধু তোমার নির্মাণ । যাহা কিছু বলি, ভাবি,
তোমারি সে নাম-উচ্চারণ ;
আমাদের মুখপানে চেয়ে আছে আকাশ মায়াবী
স্নেহস্রাবী এ তব নয়ন ।

এই যে রজনী যাপি দীর্ঘতমা, কে দিয়েছে বল,
কে দিয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী আশা ?
অনাগত উষালোকে খুলে দিবে তিমির-অর্গল
কার সেই বাণীর বিভাসা ?

চিত্ত মোর ভয়হীন, কার ডাকে উচ্চ মোর শির
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট?
সাজায়েছ বীরসাজে, দিয়েছ যে কার্মুক-তূণীর
বক্ষোপরি আয়স-কঙ্কট।

আজ বীত বহ্নি, মোরা তব ভস্ম-অবশেষ,
আছে তবু কুসুমসময়—
সৃষ্টির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে স্থাপিয়াছ যে উপনিবেশ
তারি মাঝে তোমারি উদয়॥

শরৎচন্দ্র

অনেকে অনেক কথা গদ্যে-পদ্যে বলিবে এখন :
নাটকে-নভেলে-ফিল্মে তুমি ছিলে সকলের সেরা,
বেরুবে শরৎ-সংখ্যা—খেয়ালি-দীপালি-বাতায়ন,
কাঁদিবে অনেক ছাত্র, কোলাহল করিবে মেয়েরা।

সভা হবে বহুখানে, পাটনায় বহরমপুরে,
প্রফেসর-চক্ষু হতে বিগলিবে মামুলি বেদনা :
কখানা বিস্কুট খেত দিনে-রাতে তোমার কুকুরে
এই মতো হবে জানি সূক্ষ্ম-স্থূল বহু গবেষণা।

কী বিচিত্র শোভাযাত্রা—ইন্দ্রনাথ, বেণী, দেবদাস,
সাবিত্রী, অভয়া, রমা সভাস্থলে দাঁড়াইবে নামি',
খোঁড়া পায়ে সব্যসাচী দিগ্বিদিকে জাগাবে সন্ত্রাস,
আসিবে নতুন-দাদা, জলপথে টগর বোষ্টমি।

নিস্তব্ধ সংকীর্ণ শীর্ণ আতঙ্কিত অন্ধকার গলি—
শীতার্ত নাগিনী যেন লুকায়েছে ইঁটের প্রাচীরে,
দুয়ারে বাজিল কড়া, কুপি হ'তে ধোঁয়ার কুণ্ডলী-
আমি শুধু দেখিতেছি পাপীয়সী কিরণময়ীরে।

সেই শিখা, সেই জ্বালা, ললাটে সে ভয়াল সিঁদুর,
তাম্বুল-আলিপ্ত সেই জর-জর তপ্ত ওষ্ঠাধর,
উদ্বেলিত তুঙ্গবক্ষে ফেনময় তরঙ্গ ভঙ্গুর—
দুটি মাত্র চক্ষুপাতে তোমারে স করেছে অমর।

তুলসীতলায় রমা জ্বালে জানি বাতি চুপি-চুপি,
সুরেশ পোড়ায় জানি বহু মূর্খ মহিমের ঘর,
কিন্তু সে অপরিচ্ছন্ন ক্লেদক্লিন্ন ধূমময় কুপি
দেখি নাই কোনোদিন এত তীব্র, এমন ভাস্বর॥

শরৎচন্দ্র

শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিব দূর হ'তে—এই ভেবে ধরিনু লেখনী
নিরানন্দ, ছন্দোহীন ; অকস্মাৎ দুয়ারে কাহার করধ্বনি !
কে আসিল বর্ষাশেষে, ভাদ্রের সংক্রান্তি-লগ্নে,—খুলে দিনু দ্বার,
কি অমৃততরঙ্গিনী ! ভীরু কণ্ঠ উচ্চারিল : "তুমি ? চমৎকার !"
আকাশের দূর চন্দ্র মূর্ত আজি মোর আঁখি-তারকার কাছে,
নাহিক' মহার্ঘ অর্ঘ্য, কবিতা কুণ্ঠিতা অতি—কিঁ বা মোর আছে !
কিছু নাই। অসম্পূর্ণ মাল্য বৃথা। আসিলে মর্মের কাছাকাছি
সন্তর্পণে। "কিছু নাই ?" ফুকারিলে স্নিগ্ধস্বরে : "তাই আসিয়াছি।"
রিক্ততার বিত্ত ল'য়ে দাঁড়াইলে স্বল্প, শীর্ণ, সুমধুর হেসে,
তৃপ্তিকর করস্পর্শে সম্ভাষিলে বন্ধুর মতন ভালোবেসে।
নিভৃত নৈকট্য মাঝে অনন্ত মাধুর্য্যরস,—এত ভালো লাগা,
বন্ধুতায় মিশাইলে সুস্নিগ্ধ সোহাগ যেন সোনায় সোহাগা ॥

নভে শুভ্র অভ্রমালা, উড়ে চলে শুভ্রপক্ষ চঞ্চল বলাকা,
কাশের কাননপথে লাজুক বঙ্কিম নদী দিয়াছে গা-ঢাকা
অর্ধস্ফুটফেনা। দূরে কৃষকের কুটিরের কুণ্ঠিত বাতিটি
জ্বলিতেছে ইন্দুপাণ্ডু কিশোরীর হৃদয়ের মত। কা'র চিঠি
পড়িয়াছি, কা'র মন্ত্র মৃত্যুহীন অন্তরে তুলেছে প্রতিধ্বনি,
বল্লরীবেষ্টিত পল্লীপ্রান্তরের পারে কা'র আলাপী চাহনি !

মনে পড়ে প্রিয়াহীন নির্জন নিস্তব্ধ গৃহে নিঃসঙ্গ 'রোহিনী'
নিবিষ্ট রন্ধন কার্যে; তপস্যাবিশীর্ণ-কান্তি কোথা বিরহিনী
সুনির্ভয়া সে-'অভয়া'? ভালে তার জ্বলে নাকি সতীত্ব-সিঁদুর?
মরণের পরেও কি 'বিরাজের' মুখখানি ম্লান, বিপাণ্ডুর?
কুলিশকঠোরব্রতচারিণী অপর্ণা সেই—প্রেমের মন্দিরে
নিত্যকাল কাব্যলক্ষ্মী—ভুলি নাই, ভুলি নাই সে-'রাজলক্ষ্মীরে'।
মানুষেরে দেখিলাম কত বড় অনাত্মীয় দেবতার চেয়ে,
'সাবিত্রী' সে দেবী নয়, মলিনা মমতাময়ী মানুষীর মেয়ে।

যিনি ভানু, অমর্ত্য কৃশানু, তিনি থাকুন সোনার সিংহাসনে
কীর্তিমান। তুমি এস গঙ্গার মাঙ্গল্যপূত বঙ্গের অঙ্গনে,
সন্ধ্যামল্লিকার গন্ধে, ঘনবনবেতসের নিভৃত ছায়ায়,
নম্রমুখী তুলসীর শ্যামশ্রীতে,—এসেছ নদীর গেরুয়ায়!
বঙ্গের মাটির মত সুশীতল চিত্ত তব, তবু অনির্বাণ
জ্বলে সেথা দুঃখ-শিখা, সে-আগুনে নিজেরে করেছ রূপবান।
তোমার সে-প্রশ্ন আজো মর্মে বাজেঃ "বেঁচে বলো আছ কার তরে?"
সবিস্ময়ে শুনি আজ জীবন মুখর তব তাহারি উত্তরে॥

মহাত্মা গান্ধী

চাম-মেদ-মাস কিছুই দেখি না
আমি শুধু দেখি হাড়,
সংহারশেষে আনিল যা দেশে
নব উপসংহার।
এই শাদা হাড়ে জানি একদিন
বজ্র তৈরি হয়েছে। কঠিন
মৃত অঙ্গারে জ্বলেছে অগ্নি-
শিখার অঙ্গীকার।

সেই হাড় আজ দণ্ড হয়েছে
কুহককরের হাতে,
ভয় নেই বলি উঠিয়া দাঁড়াল
যে ছিল অধঃপাতে।
যেই মরা কাঠে ধরেছিল ঘুন
সেখানে জাগিছে পত্র-প্রসূন
মরুপ্রান্তরে নেমেছে বর্ষা
মেঘের অসাক্ষাতে।

নী ল আ কা শ

যে হাড়ে কুলিশ সে হাড়ে কুহক
এ কী সে ইন্দ্রজাল।
নগ্নচরণে চলে ঘরে-ঘরে
ভারতের ভূমিপাল।
সোনা হয়ে যায় যা ছিল সিকতা,
পশুর মাঝারে জাগিছে দেবতা,
অস্তায়মান সূর্য আনিছে
প্রভাতের প্রাক্কাল॥

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু

আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন মহাত্মা।
নিরীহ মফস্বলের নির্জীব রাত্রে কানে এসে পৌঁছুলো
দুঃশ্রব দুঃসংবাদ।
এ কি বিশ্বাস করবার মত? এ কি আয়ত্ত করবার?
মহাচ্ছায় বনস্পতি কি নিমেষে উন্মূলিত হবে
বাতুল বাত্যার অভিঘাতে?
নিবাতনিষ্কম্প অভ্রান্ত অর্চি কি নির্বাপিত হবে
আকস্মিক ফুৎকারে?
এক নিশ্বাসে শুকিয়ে যাবে কি সেই সর্বসমুন্দর নির্মল স্নেহসিন্ধু?
যোগসিংহাসন ছেড়ে মহাপ্রয়াণ করবেন কি
মহাযোগী মহারাজ—
ভারতের সারনাথ?
বিশ্বাস করতে পারিনা। কে পারে বিশ্বাস করতে?
বন্ধুহীনের যে বন্ধু,
নিঃস্বজনের যে আশ্রয়,
গৃহহীনের যে আচ্ছাদন,
সঙ্গীহীনের যে শরণাগতপালক—
অবিঘ্ন ও অকপট, মুক্ত ও ছলশূন্য,
অপাপ অকাম অকোপ অখেদ
পুণ্যপুঞ্জতীর্থজলনিধি—

তাঁর উপর হানবে কে আগ্নেয় আঘাত,
কার হবে এই বর্বর বিরুদ্ধতা ?

জেনে রাখো, কে সেই হত্যাকারী।
তাঁরই স্বদেশবাসী—
যে দেশকে তিনি পদদলিত পথধূলি থেকে
নিয়ে এসেছেন সুবর্ণসৌধশীর্ষে :
তাঁরই স্বধর্মাশ্রয়ী—
যে ধর্মকে তিনি মার্জিত করেছেন
আচারের আবিল আবর্জনা থেকে।
প্রার্থনাপিপাসু চিত্তে
কাতর জনতার সম্মুখীন হচ্ছেন
সমাধিনিষ্ঠ সাধনায়,
অমনি নিক্ষিপ্ত হল ঘাতকের অস্ত্র
নির্বুদ্ধি নির্দয়।
এ ঘাতককে প্রেরণ করেছে চক্রান্তকারী ইতিহাসের বক্রতা,
নির্মাণ করেছে জিঘাংসাজর্জর জগৎনাট্যের কালকূট।

জানতে চাইনা।
জানতে চাই সেই ঘাতসহকে,
সেই অঘাতনীয়কে।
যার অভাবে ধরণী ভারভ্রষ্ট হল সেই ধরণীধরকে।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু

প্রশ্ন করি, এই কি সেই মহৎ পর্যটনের যাত্রাশেষ ?
এই কি সেই মহৎ পরীষ্টির উদ্‌যাপন ?
এই কি নির্ধতিনির্ধার ?
অহিংসার ব্রতধারী বলি হবেন হিংসার যূপমূলে ?
বিদ্বেষবিষে পঙ্কাহত হবে মানবপ্রেমের আলিঙ্গন ?

তুচ্ছ তৃণখণ্ডও নড়েনা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া,
বৃন্তচ্যুত হয় না সামান্য জীর্ণ পত্র,
প্রস্ফুটিত হয় না বিজন সমুদ্রের সুদূর ফেনবুদ্‌বুদ।
মেঘের গায়ে যে অলক্ষিত লেখা ফোটে
শিশুর মুখে যে অহেতুক হাসি
পাখির কণ্ঠে যে অকারণ কাকলী—
সব সেই ঈশ্বর-ইচ্ছায়—
বিশ্বাস করতেন মহাত্মা!
তাই, এই ভয়াবহ মৃত্যুও কি ঈশ্বরসমর্থিত ?
এ মৃত্যুকে প্রেরণ করেছে কি ইতিহাসের রথচালক,
নির্মাণ করেছে কি জগৎনাট্যের গ্রন্থকার ?

একশো তিরিশ বছর বাঁচতেন নাকি মহাত্মা।
তারপরেও তাঁর জীবন একদিন অবসান হত—
হয়তো বা দুঃসহ রোগে, নিঃসহ জরায়,
হয়তো বা আত্মঘাতী অনশনে।

সে মৃত্যুর চেয়ে এ মৃত্যু কি মহনীয় নয় ?
জ্যোতির্ময় নয় ?
নয় কি অর্থান্বিত ও সমীচীন ?
এ বীরের মৃত্যু, তপস্বীর মৃত্যু,
মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করার অস্বীকার করার
পরাভূত করার মৃত্যু।
মহাভারতের মহালাভের পর মৌন মহাপ্রস্থান।
এ দধীচির মৃত্যু—
অস্থায়ী অস্থি-র চিতাগ্নিতে সুচিরজীবিনী দীধিতি।
আমাদের চারদিকে শব্দহীন সান্দ্র অন্ধকার—
তার মাঝে জ্বলবে এই স্থির শিখা, অক্ষুণ্ণ বিভাসা,
কল্যাণ-আলয়ে স্নিগ্ধ আশ্বাসের মত।
যা বলহীনের বরাভয়,
অশরণের আচ্ছাদন,
নাথহীনের তনুত্রাণ।
অবিশ্বাসীর আস্তিক্য-আরাম,
যুযুধানের সামবাণী।
মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষার প্রতিভাস।
ইতিহাসের যে পৃষ্ঠা রঞ্জিত হল তাঁর রক্তে
তার পরেই হয়তো শুভ্রতার পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছেদ
অবৈরিতার শুভারম্ভ।
এই মৃত্যু তাই তাঁর সাধনার সারবিন্দু,
যথার্থ ও যথাকালীন।
এ মৃত্যু তাঁর জীবনশ্লোকের প্রকৃত ভাষ্যকার।

•

ম হা ত্মা গা ন্ধী র মৃ ত্যু

এ মৃত্যু ছাড়া উদ্‌ঘাটিত হত না তাঁর
জীবনবহনের চূড়ান্ত মহিমা,
সম্পূর্ণ হত না তাঁর জয়গাথার শেষ চরণ।

কে জানে—

প্রায় দুহাজার বৎসর আগে
এমনি করে মেরেছিল আরেকজনকে
তাঁরই স্বদেশবাসীরা।
তারা কিন্তু আজও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে
অভিশপ্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
খুঁজে পাচ্ছেনা তাদের দেশ, তাদের স্থান, তাদের আশ্রয়।
আমরাও কি অতঃপর অমনি করে
দেশহারা স্থানহারা আশ্রয়হারা হয়ে ঘুরে বেড়াব?
না, চিরন্তন-সম্মুখবর্তী বর্তিকায়
খুঁজে পাব আমাদের মন্ত্রসিদ্ধির সরণি?

ভারতবর্ষ

আসমুদ্রহিমাচল
হে আমার অখণ্ড-অটুট সর্বাঙ্গসুন্দর ভারতবর্ষ,
জীবনের মধ্যদিনে এসে
আর এক বার দেখে নিই তোমাকে।
শিয়রে দুর্ধর্ষ পর্বত,
পার্শ্বে-নিম্নে সংঘবদ্ধ সমুদ্রের আবৃতি,
আর আদ্যোপান্ত ধূসর-প্রসর প্রান্তরের অন্তহীনতা।
—অঘাতনীয়, অলঙ্ঘনীয় ভারতবর্ষ।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর কুলপঞ্জীতে তুমি অনন্যনামধেয়,
স্বনামপ্রশস্ত—
ভূগোলে ও ইতিহাসে শ্রৌতে ও ঐতিহ্যে
কুলক্রমাগত সংস্কৃতিতে
অধ্যাত্মসন্ধানে
বন্ধনছেদন ও শোষণশোধনের সাধনায়
সমর্থ হবার, বিশাল হবার, মহান হবার প্রতিশ্রুতিতে
তুমি এক ও অবিভাজ্য।
তুমি বিবিধের মধ্যে বিশেষ, বহুলের মধ্যে বিরল,
বিচিত্রের মধ্যে অনির্বচনীয়।
তোমাকে নিয়ে কত মহাকাব্যকারের স্বপ্ন,
কত দুর্দান্ত সৈনিকের নিয়ন্ত্র ও নিরবশেষ সংগ্রাম
কত তপস্বীর সুদূর-দুর্গম তীর্থযাত্রা—

আহিত অগ্নিতে অরণির নিমন্ত্রণ।
যত গীতগাথা যত ললিত-কণিত-কলা
যত ভাস্কর্য আর সৌধশিল্প
যত নিঃসহায় অশ্রু আর উত্তপ্ত রক্তস্রোত
কারান্তরালে যত কালরাত্রির উদ্‌যাপন
মহান সে মরীচিমালীর প্রতীক্ষায়—
সব, তুমি এক ব'লে, অবিচ্ছেদ্য ব'লে
আশিরপদনখ অব্যাহত ব'লে।
হে আমার স্বপ্নের ও ভাবের
ধ্যানের ও প্রত্যাশার ভারতবর্ষ!

হে বাত্যাবিহারী উদ্দাম বিহঙ্গম,
কুটিল চক্রের কৌশলে আজ তুমি ছিন্নপক্ষ
নিম্ননিক্ষিপ্ত।
কিন্তু, চেয়ে দেখ, তুমি আকাশচ্যুত হলেও
মুছে যায়নি তোমার আকাশ,
আজও সে অক্ষুণ্ণ, অভ্রান্তলক্ষ্য।
সঙ্কুচিত হয়নি তোমার ধাবন-বিহরণের পরিধি।
কুটিল চক্রের কৌশলে বেধেছে আজ সংকীর্ণ স্বার্থের সংঘাত
রাজ্যলোভী মধ্যবিত্ত গৃধ্নুতা
ক্ষমাক্ষান্তিহীন নখরদংষ্ট্রার উদ্‌ঘাটন;
খণ্ডে-খণ্ডে বণ্টন-কণ্টকিত ব্যূহ-বেষ্টনীর চাতুরী
প্রাচীরের তলে সর্বনাশের পরিখা।

কিন্তু তুমি তো জান, আপদ্ধর্মের চেয়ে
বড় হচ্ছে আপামর-সাধারণের ধর্ম,
সবার উপরে হচ্ছে মানুষ,
মনুষ্যত্বের আবেদন।
তাই চক্রনেমিক্রমে একদিন কূট-কটোর থেকে বেরিয়ে পড়বে জানি
অগণন সেই মানুষের নিঃস্বতি—
পতিত-দুঃস্থিত স্খলিত-গলিত অধম-অধোগত
অবর-অবনত শুষ্কীকৃত জনতা—
অপ্রতিরোধ্য অনন্তবীর্যের বাহিনী।
বেরিয়ে পড়বে ঐকরাজ্যের প্রতিষ্ঠায়
সকল চক্রান্তের উর্ধ্বে সফল চক্রবর্তিত্বে।
সেই উদ্বেল-উত্তাল জন-গণ-জল-বলের আঘাতে
কোথায় থাকবে তোমার সেই প্রাচীর-পরিখা
ব্যূহ-বন্ধনের ব্যবধান।
কোথায় যাবে তোমার সেই দেহরক্ষী দ্বারপালের দল।
তুমি আবার করবে তীর্থযাত্রা
জনতন্ত্রের মন্ত্র নিয়ে
মানবতার লুপ্তোদ্ধারে
সুভ্রাতৃত্বের সংস্থাপনে।
জন-পদচিহ্নে মুছে যাবে ক্ষীণ-অঙ্ক সীমারেখা
সমস্বামিত্বের প্রয়োজনে।
আবার তুমি এক ও একীকৃত।
হে আমার ভবিষ্যমান ভারতবর্ষ,
ক্ষয়ের অযোগ্য স্বর্গলোক,

দেখি আজ আবার তোমার সেই আগামী দিনের মহিমা।
তোমার সেই প্রত্যাশা-প্রস্ফুট সম্ভাব্যতা।
ভাবরূপ থেকে তুমি আবির্ভূত হবে বাস্তবে
সত্যস্বপ্নের স্পষ্টতায়।
হে বিস্তীর্যমান ভারতবর্ষ,
আজ থেকে আমরা তোমার বাস্তবরূপের স্তবকার॥

স্বাধীনতা

চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছি না :
আমার প্রকাশ্য গৃহচূড়ে উড়ছে আমার স্বদেশের পতাকা—
তিমিরমুক্ত অম্বরের অভিমুখে
উত্থিত হচ্ছে আমার নিরুদ্ধ আত্মার প্রথম উদার সম্ভাষণ
আমার জন্মের প্রথম জয়ঘোষণা।
এক প্রান্তে গম্ভীর গৈরিক
অনপনেয় দুঃখের ঔদাস্য আর অপরিমেয় ত্যাগের প্রসন্নতা ;
অন্য প্রান্তে উল্লাস-উজ্জ্বল সবুজের অপর্যাপ্তি
অমিত জীবনের সৃজনসৌন্দর্যের উদ্ভাসন ;
মধ্যস্থলে তুষারসঙ্কাশা শুভ্রতা
কর্মের নির্মলতা ও অনবদ্য অন্তরমাধুর্যের প্রতীতি।
আর সেই শুভ্রতার অন্তরে ঘননীল অশোকচক্র,
সমস্ত অলাতচক্রের উর্ধ্বে
শান্তির স্থির বাণী
দিকে-দিকে দেশে-দেশে মৈত্রীর আমন্ত্রণ ;
শোকশূন্য সময়ের ঘূর্ণ্যমানতার প্রতীক
বর্তমান থেকে বৃহত্তর ভবিষ্যতের
মহত্তর সম্ভাবনায় নিয়ত-আবর্তিত
উড়ছে আমার ধ্রুব বিশ্বাসের ধ্বজপট
আমার বীজমন্ত্রের বৈজয়ন্তী।

•

স্বা ধী ন তা

কত দুর্গম পর্বত ও কত কণ্টকক্লেশিত অরণ্য পার হয়ে
কত দুঃসহ দুর্যোগের মধ্য দিয়ে
অভ্রান্তলক্ষ্যে চলে এসেছ তোমরা,
দৃঢ় হাতে বহন করে এনেছ এই পতাকাকে।
কত রোষকষায়িত কশা, কত বলদর্পিত বুট
কত বর্বর বুলেট
ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে তোমাদের,
কিন্তু বজ্রমুষ্টি শিথিল করতে পারেনি,
স্খলিত করতে পারেনি তোমাদের পতাকার উদ্ধতি,
নমিত করতে পারেনি তোমাদের দুষ্পরাজেয় প্রতিজ্ঞা।
মায়ের বুকে সন্তানের মত
পক্ষীচঞ্চুপুটে তৃণখণ্ডের মত
বারুদের বুকে বহ্নিকণার প্রত্যাশার মত
বহন করে এনেছ এই পতাকা
যাতে আমি প্রোথিত করতে পারি আমার প্রকাশ্য গৃহচূড়ে।
নবীনারম্ভের নিশ্বাসে বিস্তার করতে পারি বুক,
উজ্জ্বল উপলব্ধিতে উদ্ধত করতে পারি মেরুদণ্ড।

লেখনীকে বিশ্বাস করতে পারছি না
যা আমি আজ লিখছি এই মুহূর্তে।
কত বাক্য রুদ্ধ হয়ে গেছে তোমাদের কণ্ঠে
দলিত হয়েছে কত অরুন্তুদ আর্তনাদ
স্তব্ধ হয়েছে কত বঞ্চিত বুকের দ্রোহবাণী।
সত্যভাষের সেই অধিকারকে তবু বিধ্বস্ত হতে দাওনি,

নী ল আ কা শ

বহন করে এনেছ এই পতাকা
এই উদাত্ত বীরবার্তা ;
তন্দ্রিত আকাশে মুক্ত করে দিয়েছ
সিতপক্ষ কলহংসের কাকলী,
যাতে আমি পেতে পারি আমার ভাষা
লেখনীতে অপরাঙ্মুখ তীক্ষ্ণতা।

তাই আজ এই পতাকাকে যখন প্রণাম করি
প্রণাম করি তোমাদের দুর্জয় বীর্যবত্তাকে।
স্মরণ করি তোমাদের
যারা ফাঁসির রজ্জুকে মনে করেছ কণ্ঠলগ্ন কোমল ফুলমালা
মৃত্যুতে দেখেছ অমরত্বের রাজধানী।
স্মরণ করি তোমাদের
নাগনক্ষত্রে যাদের যাত্রা,
যারা কারাকক্ষে নিয়তিনির্দিষ্ট হয়ে
যাপন করেছ অবিচ্ছেদ্য অন্ধকার,
আকাঙ্ক্ষার অগ্নিতেজে তপ্ত রেখেছ বক্ষস্থল,
জতুগৃহদাহে দেখেছ ইন্দ্রপ্রস্থের নির্মিতি।
আর তোমাদের স্মরণ করি
সেই সব অগণন নামহীন পথিক পদাতিকের দল,
নির্বিশঙ্ক জীবনের আহ্বানে
পদে-পদে রক্তচিহ্নিত করেছ পথ-প্রান্তর-জনপদ,
ঘরে ঘরে জ্বেলেছ
জায়া-জননীর হাহাকারের দাবাগ্নি।

স্বা ধী ন তা

যাতে আমি জীবনে পেতে পারি মর্যাদা
অমূল্য মূল্যবোধ।
যাতে হাতে পেতে পারি তেজিষ্ঠ লেখনী
কণ্ঠে পেতে পারি দুর্বার কলস্বন
আর প্রকাশ্য গৃহচূড়ে এই অপ্রকম্প পতাকা॥

কাজ করো

প্রত্যেক কাজের মাঝে আমি-তুমি প্রত্যহ একাকী :
এখনো অনেক কাজ বাকি।

তুমুল তুফানশেষে মিলেছে যদিও স্বর্ণতীর,
এখানেই রচিব না আমাদের বিশ্রাম-শিবির ;
তীরের প্রান্তের থেকে সরণির নতুন সূচনা,
আরম্ভের জলস্রোতে সুদূর সমুদ্র-সম্ভাবনা।
ক্ষীণ রৌদ্র হবে খরতরো,
কাজ করো, কাজ করো।

দুর্যোগরাত্রির পারে প্রভাতের প্রসন্ন সুযোগে
জীবনেরে নিতে হবে গর্বদীপ্ত গম্ভীর সম্ভোগে ;
তিমিরগুহার মুখে মিলিয়াছে যেইটুকু বিভা
তারে আরো উজ্জ্বলিবে আমাদের প্রজ্ঞান-প্রতিভা।
প্রতিজ্ঞা-পতাকা উচ্চে ধরো,
কাজ করো, কাজ করো।

সৃষ্টির নৃত্যের ছন্দে প্রতিটি মুহূর্ত ধরো ধরো
কাজ করো, কাজ করো।

•

চাষ করো, পথ বাঁধো, দূর করো বন্য আবর্জনা,
প্রতি পদে আনো নব নির্মাণের নির্মল ব্যঞ্জনা।
পেশী বুদ্ধি শক্তি হৃদি—এক স্কন্ধে ফেল আজ ধুরা,
এক রথ টানো সবে এক প্রাণে প্রেরিত বন্ধুরা।
সাধনার স্বর্ণসৌধ গড়ো,
কাজ করো, কাজ করো।

এখনো অনেক পথ, প্রক্ষালিতে হবে বহু পাপ,
আত্মনীন লোলুপতা, তৃণলীন তীক্ষ্ণদংশ সাপ—
শাসন-গৃহীত-মুষ্টি শোষণের আনো শেষ দিন,
বন্ধনের প্রতিবন্ধ, হে নবীন, হে চিরকালীন,
অন্যায়ের মুখোমুখি লড়ো,
কাজ করো, কাজ করো।

নতুন সূর্যের তেজে তুমি-আমি আজি কত বড়ো,
কাজ করো, কাজ করো॥

পুরাবৃত্ত

একদিন দেখেছি তোমারে,
জ্বলেছ ভাস্বর সূর্য বন্ধন-রাত্রির অস্বীকারে।
পাপলেশপরিশূন্য, তপোনিষ্ঠ, ঋজু, উর্জস্বান,
দারিদ্র্য-দহন-কান্তি তোমারে করেছে রূপবান।
দেখেছি তোমার সিদ্ধি, দৃঢ় তপশ্চারণের ক্লেশ,
লোভ নাই, স্নেহ নাই, নাই দ্বন্দ্ব, বিমুক্তবিদ্বেষ—
প্রতিজ্ঞায় অপ্রকম্প, অবিচ্যুত লক্ষ অত্যাচারে,
একদিন দেখেছি তোমারে॥

তোমারে দেখেছি একদিন
মনস্তন্ত্রে একমন্ত্র—রব নিত্য স্বার্থস্পর্শহীন।
কর্মফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী সেই কর্ম নিয়ত-নির্মল,
স্বর্গসুখ চাহ নাই, এ জীবন উৎসর্গ-উজ্জ্বল।
প্রকৃতি বিকৃতিশূন্য, রিক্ততায় মহাবিত্তভোগ,
শীতে-উষ্ণে সমজ্ঞান, সমজ্ঞান সুযোগ-দুর্যোগ।
সত্যতপ্ত মনোবাক্য, মেরুদণ্ড প্রদীপ্ত, স্বাধীন
তোমারে দেখেছি একদিন॥

তোমারে আবার দেখিলাম
প্রবৃত্তির বৃত্তে বাঁধা খুঁজে মরো কোথা সুখধাম।

কোথা তুষ্টি মুষ্টি-মুষ্টি, কোথা শক্তি, আসক্তি-আরতি,
মোহালসধ্যানমগ্ন হয়ে আছ বদ্ধ বকব্রতী।
দ্বারে-দ্বারে রাজপথে পথভ্রান্ত ঘনায় জনতা,
আত্মবৃদ্ধিবুদ্ধি তুমি, দেখ শুধু আপাতরম্যতা।
সংগ্রামের শেষ অঙ্কে দেখ নিম্নে পঙ্কিল বিশ্রাম,
তোমারে আবার দেখিলাম॥

দেখিব তোমারে আরবার
যোগযুক্ত কর্মবীর লোভশূন্য নির্মম দুর্বার,
ত্যক্তসর্বপরিগ্রহ, মুক্ত, সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী,
নিঃস্বার্থ সেবার ব্রতে দ্বারে-দ্বারে দাঁড়াইবে আসি—
আয়ুষ্য-আরোগ্যপ্রদ ভয়হর সূর্যের মতন
আবার উদয় তব, পুন সে সহর্ষ আকর্ষণ।
শুদ্ধ কর্ম, দূরগত কর্তৃত্বের লুব্ধ অহঙ্কার,
তোমারে দেখিব আরবার॥

এর পরে আরো এক পরিচ্ছেদ আছে

এর পরে আরো এক পরিচ্ছেদ আছে,
এখনি পেয়োনা ভয়! বৃদ্ধ বট গাছে
এখনো পড়িছে ছায়া, বাতাসে বাদাম
এখনো উঠিছে ফুলে। শান্ত, নির্বিরাম
এখনো বহিছে শীর্ণ নদীটির ধারা,
জানালার দীপটিরে দিতেছে পাহারা
এখনো তারার স্নেহ। নব, স্রব, ঘন
মাঠের উপরে মেঘ ঘনায় এখনো।
হলোৎকীর্ণ মৃত্তিকায় বাধা-বন্ধ ঠেলি
আপীতহরিৎ শস্য চায় চক্ষু মেলি
আমূল নতুন। এখনি ছেড়োনা আশা,
তোমার চক্ষুর লাগি রয়েছে পিপাসা
চক্ষে আজো। এখনো চন্দ্রেরে দেখা যায়,
এখনো মাথার পরে রয়েছে বজায়
আশ্চর্য আকাশ। এখনো কান্নার স্বর
শোনা যায় সদ্যোজাত অনঘ শিশুর ॥